‘আস্তিকতা বনাম নাস্তিকতা’র প্রত্যুত্তরে

অভিজিৎ রায়

জনাব মেজবাহউদ্দিন জওহেরের আস্তিকতা এবং নাস্তিকতা নিয়ে অত্যন্ত সুলিখিত লেখাটি পড়বার পর থেকেই এ নিয়ে কিছু লিখবার তাগিত অনুভব করছি। প্রবন্ধটির গঠন শৈলী এবং ভাষাবিন্যাসের জন্য কেবল নয়, প্রতিপক্ষের চিন্তাধারার প্রতি তাঁর সন্মানবোধ, বিপরীত মতগুলোকেও যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে নেওয়া, যাচাই করা, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে খন্ডন করার চেষ্টা করা সব কিছুর ব্যাপারেই তার লেখাটি আমাদের জন্য একটি আদর্শ হতে পারে।

জওহেরের সাহেবের প্রবন্ধটিকে খন্ডন করবার জন্য নয়, মূলতঃ নিরপেক্ষভাবে কিছু তথ্য তুলে ধরতেই আমার আজকের এই লেখা। হয়ত ব্যাপারটিকে ‘অর্থহীন বিতর্কের সূচনা’ বলে মনে হতে পারে, কিংবা মনে হতে পারে অযথা কালক্ষেপণ, কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের এই উন্মুক্ত আলোচনায় আমরা নিজেরা তো বটেই, উপকৃত হবেন অগনিত সাধারণ পাঠকেরাও। এটি প্রয়োজনীয়, কারণ, রাষ্ট্রীয় পক্ষপাতদুষ্ট আইন-কানুনের সীমাবদ্ধতায় এ ধরনের আলোচনা দেশে কখনই সম্ভব হত না; আমরা দেখেছি প্রচার মাধ্যম এবং সংবাদ পত্র গুলোও ‘তাঁবেদারদের তল্পিবাহক’ হিসেবে সবসময়ই থেকে গিয়েছে, যুক্তি-তর্কের গঠনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে মুক্ত-মনের বিকাশে কখনই উদ্যোগ নেয় নি; ধর্মের রাজনীতি আর ধর্মানুভূতিটাই যেন তাদের কাছে মূখ্য, ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তি-বুদ্ধির চর্চা পদে পদে হয়েছে বাঁধাগ্রস্ত, কখনও বা নির্মমভাবে পদদলিত। ইন্টারনেট আসার ফলে এ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি অনেকটাই। এখানে আইনের যাঁতাকলে পড়ে তথ্যের আদান-প্রদান একপেশে ভাবে আর বাঁধাগ্রস্ত হয় না; ফলে দুই পক্ষই নির্ভয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে- হোক না যতই তা ধর্মবিরুদ্ধ, প্রথাবিরুদ্ধ। নিরপেক্ষ পাঠকেরা দুপক্ষের বক্তব্য থেকে সহজেই সত্যের নির্যাসটুকু আস্বাদন করতে পারবেন।

জওহের সাহেব নাস্তিকতার সংজ্ঞা যে ভাবে দিয়েছেন, তার সাথে আমি একদমই একমত নই। তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি উপন্যাসের (সম্ভবত গোরা) একটি চরিত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে চেয়েছেন নাস্তিকরাও এক অর্থে বিশ্বাসী। তারা ‘না-ঈশ্বরে’ বিশ্বাসী। জওহের সাহেব শুধু নন, আমি দেখেছি অনেকেই বুঝে হোক, না বুঝে হোক, এই ব্যাপারটি মাঝে মধ্যে এভাবেই আউরে দেন যে, আস্তিক্যবাদের মত নাস্তিক্যবাদও একধরনের বিশ্বাস। আস্তিকরা যেমন ‘ঈশ্বর আছে’ এই মতবাদে বিশ্বাস করে, তেমন নাস্তিকরা বিশ্বাস করে ‘ঈশ্বর নেই’ - এই মতবাদে। দুটোই নাকি বিশ্বাস। এ বইয়ে সন্নিবেশিত ‘সংশয়ীদের ঈশ্বর’ নামক আরেকটি প্রবন্ধে আহমাদ মোস্তফা কামাল প্রায় একই ধরণের মতামত প্রকাশ করে বলেছেন –

> ‘আস্তিকতার বিপরীত শব্দ নাস্তিকতা নয়, এই দুটো শব্দ দুটো বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে। একটি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, অন্যটি ঈশ্বরের অনস্তিত্বে বিশ্বাস।‘

নাস্তিকদের এভাবে সংজ্ঞায়ন সঠিক কি ভুল, তা বুঝবার আগে 'নাস্তিক' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থটি আমাদের জানা প্রয়োজন। 'নাস্তিক' শব্দটি ভাংলে দাঁড়ায়, নাস্তিক + কন বা নাস্তি+ক। 'নাস্তি' শব্দের অর্থ হল নাই, অবিদ্যমান। 'নাস্তি' শব্দটি মূল সংস্কৃত হতে বাংলায় এসে 'ক' বা 'কন' প্রত্যয় যোগে নাস্তিক হয়েছে যা তৎসম শব্দ হিসেবে গৃহীত। ন আস্তিক = নাস্তিক - যা ন ঞ তৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ এবং আস্তিকের বিপরীত শব্দ। আরো সহজ করে বাংলায় বললে বলা যায়, *না + আস্তিক = নাস্তিক*। খুবই পরিস্কার যে, সঙ্গত কারণেই আস্তিকের আগে 'না' প্রত্যয় যোগ করে নাস্তিক শব্দটি তৈরী করা হয়েছে। আস্তিকরা যে ঈশ্বর/আল্লাহ/খোদা ইত্যাদি পরম সত্ত্বায় বিশ্বাস করে এ তো সবারই জানা। কাজেই নাস্তিক হচ্ছে তারাই, যারা এই ধরণের বিশ্বাস হতে মুক্ত। তাই সংজ্ঞানুযায়ী নাস্তিকতা কোন বিশ্বাস নয়, বরং 'বিশ্বাস হতে মুক্তি' বা 'বিশ্বাসহীনতা'। ইংরেজীতে নাস্তিকতার প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Atheist'। সেখানেও আমরা দেখছি theist শব্দটির আগে 'a' প্রিফিক্সটি জুড়ে দিয়ে Atheist শব্দটি তৈরী করা হয়েছে। অ্যাথিজমের উপর বহুল প্রচারিত গবেষণাধর্মী একটি ওয়েব সাইটে শব্দটির সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে এভাবে –

> Atheism is characterized by an <u>absence of belief</u> in the existence of gods. This absence of belief generally comes about either through deliberate choice, or from an inherent inability to believe religious teachings which seem literally incredible. It is not a lack of belief born out of simple ignorance of religious teachings.

সহজেই অনুমেয় যে, 'absence of belief' শব্দমালা চয়ন করা হয়েছে 'বিশ্বাস হীনতা'কে তুলে ধরতেই, উলটোটি বোঝাতে নয়। Gordon Stein তাঁর বিখ্যাত 'An Anthology of Atheism and Rationalism' বইয়ে নাস্তিকতার (Atheism) সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে বলেন,

> 'When we examine the components of the word 'atheism,' we can see this distinction more clearly. The word is made up of 'a-' and '-theism.' Theism, we will all agree, is a belief in a God or gods. The prefix 'a-' can mean 'not' (or 'no') or 'without'. If it means 'not,' then we have as an atheist someone who is not a theist (i.e., someone who does not have a belief in a God or gods). If it means 'without,' then an atheist is someone without theism, or without a belief in God'. (Atheism and Rationalism, p. 3. Prometheus, 1980)

আমরা যদি atheist শব্দটির আরো গভীরে যাই তবে দেখব যে, এটি আসলে উদ্ভুত হয়েছে গ্রীক শব্দ 'a' এবং 'theos' হতে। গ্রীক ভাষায় 'theos' বলতে বোঝায় ঈশ্বরকে, আর 'a' বলতে বোঝায় অবিশ্বাস বা বিশ্বাসহীনতাকে। সেজন্যই Michael Martin তাঁর 'Atheism: A Philosophical Justification' বইয়ে বলেন, 'According to its Greek roots, then, atheism is a negative view, characterized by the absence of belief in God.' (*"Atheism: A Philosophical Justification", p. 463.,Temple University Press, 1990*) '।

আসলে নাস্তিকতাকে 'না-ঈশ্বরে বিশ্বাসের' খাঁচায় পুরে বিশ্বসীর দলে ভিরানোর ব্যাপারটি খুবই অবিবেচনাপ্রসুত। ব্যাপারটাকে আরেকটু পরিস্কার করা যাক। ধরা যাক, এক মুক্ত-মনা যুক্তিবাদী ব্যক্তি ভুতে বিশ্বাস করেন না। তবে কি সেজন্য তিনি 'না-ভুতে' বিশ্বাসী হয়ে গেলেন? জওহের সাহেবের যুক্তি অনুযায়ী তাই হবার কথা। এভাবে দেখলে, প্রতিটি অপ-বিশ্বাস বিরোধিতাই তাহলে উলটোভাবে 'বিশ্বাস' বলে চালিয়ে দেওয়া যায়, তা সে ভুতই হোক, পঙ্খিরাজ ঘোড়াই হোক, অথবা ঘোড়ার ডিমই হোক। যিনি পঙ্খিরাজ ঘোড়া বা চাঁদের চড়কা-বুড়ীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তিনি আসলে তাঁর সংশয় এবং অবিশ্বাস থেকেই তা করেন না, তার 'না-বিশ্বাসে' বিশ্বাসী হবার কারণে নয়। যদি ওই ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন ওগুলোতে তিনি বিশাস করেন না, তিনি হয়ত জবাবে বলবেন, ওগুলোতে বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি বলে। কিংবা হয়ত বলতে পারেন, এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওগুলো সত্ত্বার বাস্তব অস্তিত্ব কেউ প্রমাণ করতে পারেন নি, তাই ওসবে বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না। এটি পরিস্কার যে, এই বক্তব্য থেকে তার মনের সংশয় আর অবিশ্বাসের ছবিটিই আমাদের সামনে মুর্ত হয়ে ওঠে, বিশ্বাসপ্রবণতাটি নয়। ঈশ্বরে অবিশ্বাসের ব্যাপারটিও কিন্তু তেমনি। নাস্তিকেরা তাদের সংশয় আর অবিশ্বাস থেকেই 'নাস্তিক' হন, 'না-ঈশ্বরে' বিশ্বাস থেকে নয়। সে জন্যই মুক্ত-মনা Dan Barker তাঁর বিখ্যাত 'Losing Faith in Faith: From Preacher to Atheist' গ্রন্থে পরিস্কার করেই বলেছেন - 'Basic atheism is not a belief. It is the lack of belief.' (পৃঃ ৯৯)। আসলে সত্যি বলতে কি, 'বিশ্বাস' ব্যাপারটিই দাড়িয়ে আছে একটি 'অপ-বিশ্বাসমূলক' প্রক্রিয়ার উপর। আমি সুরজিত বাবুর সাথে বিতর্কের সময় ড. হুমায়ুন আজাদের সাক্ষাৎকার থেকে একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্ধৃত করেছিলাম। উক্তিটি এখানেও খুব প্রাসঙ্গিক। ড. হুমায়ুন আজাদ তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন,

> 'যে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই, যার কোন অস্তিত্ব নেই যা প্রমাণ করা যায় না, তাতেমানুষকে বিশ্বাস করতে হয়। মানুষ ভুতে বিশ্বাস করে, পরীতে বিশ্বাস করে বা ভগবানে, ঈশ্বরে বা আল্লায় বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস সত্য নয়, এগুলোর কোন বাস্তব রূপ নেই। মানুষ বলে না, আমি গ্লাসে বিশ্বস করি বা পানিতে বিশ্বাস করি, মেঘে বিশ্বাস করি। যেগুলো নেই সেগুলোই মানুষ বিশ্বাস করে। বিশ্বাস একটি অপবিশ্বাসমূলক ক্রিয়া। যা সত্য, তাতে বিশ্বাস করতে হয় না; যা মিথ্যে তাতে বিশ্বাস করতে হয়। তাই মানুষের সব বিশ্বাস ভুল বা ভ্রান্ত, তা অপবিশ্বাস।'

নাস্তিকেরা সঙ্গত কারণেই এই সমস্ত প্রথাগত অপবিশ্বাসের বাইরে।

জনাব জওহের আরেকটি বিষয় ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, '...নাস্তিক্যবাদীরা যদি অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দিতে পারতেন যে ঈশ্বর নামক কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব আদপেই নাই- তা হলে অন্য কথা ছিল। এস্থলে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন - প্রমাণ করার দায়িত্ব কি নাস্তিকদের একার? আস্তিকরাই প্রমাণ করুক যে ঈশ্বর আছেন। সে ক্ষেত্রে আমার যুক্তি হল, হ্যা **প্রমাণ করার দায়িত্ব নাস্তিকদের একার**। যুগে যুগে তাই হয়ে এসেছে।'

ধারণাটি ভুল, যুগে যুগে মোটেও তা হয়ে আসে নি। দর্শন শাস্ত্রে ‘Burden of Proof’ বলে একটি টার্ম প্রচলিত আছে যার মর্মার্থটি হল, যে কোন উটকো দাবীর যথার্থতা প্রমাণ করার দায়িত্ব দাবীদারের। আপনি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হন, পরীতে বিশ্বাসী হন, জ্বীনে বিশ্বাসী হন, পূর্ব জন্মে বিশ্বাসী হন, অ্যালিয়নে বিশ্বাসী হন - আপনাকেই এই সমস্ত বিষয়ের অস্তিত্বের যথার্তা প্রমাণ করতে হবে; যারা এগুলোতে বিশ্বাস করে না, তাদের দায়িত্ব নয় ‘অঙ্ক কষে’ আপনার দাবীকে ভুল প্রমাণ করা কিংবা নস্যাৎ করা। যিনি ভুতে বিশ্বাস করেন অথচ ভুতের অস্তিত্বের প্রমাণ চাইলেই উলটে প্রতিপক্ষের কাঁধে দায়ভার চাপিয়ে দিয়ে বলেন, ‘প্রমাণ করুন তো, ভুত বলে কিছু নেই’ - তিনি আসলে নিজের অজান্তেই একটি যৌক্তিক ভ্রান্তিতে (logical fallacy) আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, দর্শনে যার একটি সম্ভ্রান্ত নাম আছে - ‘Shifting the Burden of Proof’; সহজ বাংলায় যাকে বলে ‘উদোর পিন্ডি বুধোর ঘারে’ চাপানো। এই ভ্রান্তিটিকে দর্শন শাস্ত্রে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে-

> The burden of proof is always on the person asserting something. Shifting the burden of proof is the fallacy of putting the burden of proof on the person who denies or questions the assertion. The source of the fallacy is the assumption that something is true unless proven otherwise. *(Ref: The Atheism Web, Logic & Fallacies)*

বার্ট্রান্ড রাসেলকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল উনি ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবেন কিনা। তার জবাবে উনি বলেছিলেন:

> ‘যদি আমাকে বলা হয় প্রমাণ করতে যে জিউস, পসেইডন, হেরা কিংবা অন্যান্য অলিম্পিয়ানদের অস্তিত্ব নেই, তাহলে হতভম্ব হয়ে বসে থাকা ছাড়া আমি কোন যুক্তি খুঁজে পাব না!’

জওহের সাহেব যে যুক্তিতে নাস্তিকদের উপর ‘উদোর পিন্ডি’ চাপিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন সে একই যুক্তিতে তাহলে জিউস, হেরা, ব্রহ্মা, কালী, থর, পশুপতি, অশ্বত্থামা, ট্যাশ গরু, রামগরুরের ছানা সবকিছুকেই ‘বিনা প্রমাণে’ মেনে নিতে হয়, কারণ কেউ এখন পর্যন্ত ‘অঙ্ক কষে’ এগুলো যে আদপেই নেই - তা প্রমাণ করতে পারে নি। অবশ্যই না করতে পারার সঙ্গত একটি কারণও আছে। কারণ, দর্শন শাস্ত্র আমাদের শিখিয়েছে যে, নেতিবাচক আস্তিত্বের প্রস্তাবনা (negative existential proposition) কখনই প্রমাণযোগ্য নয়। ব্যাপারটি ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। স্কোপস মাঙ্কি ট্রায়াল খ্যাত চার্লস ব্যারো সেজন্যই বলতেন, “I don’t believe in God, because I do not believe in Mother Goose”।

বিষয়টি আরেকটু খোলসা করা যাক। বার্টরান্ড রাসেল একবার তার ‘Is There a God?’ প্রবন্ধে বলেছিলেন*, আমাদের মধ্যে যদি কেউ যদি প্রস্তাব করে যে, মঙ্গল গ্রহ এবং পৃথিবীর মাঝে একটি কক্ষপথ

* Bertrand Russell, "Is There a God?" (1952), in The Collected Papers of Bertrand Russell, Volume 11: Last Philosophical Testament, 1943-68, ed. John G. Slater and Peter Köllner (London: Routledge, 1997), pp. 543-48.

বড়াবড় একটি চীনামাটির চায়ের পেয়ালা উপবৃত্তাকার পথে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, আর পেয়ালাটা আকার-আয়তনে এতই ছোট যে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র কিংবা মহাজাগতিক অন্যান্য উপকরণ দিয়েও তাকে সনাক্ত করা সম্ভব না – কেউ কি প্রমাণ করতে পারবে যে এই চীনামাটির পেয়ালা ঘুরবার অনুমানটি ভুল? সম্ভবত নয়। কিন্তু কোন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষই অযথা – কথা নেই বার্তা নেই - পেয়ালা ঘুরবার এ ধরনের অনুমানটিকে বিবেচনায় আনবেন না, কিংবা খুব একটা আমল দেবেন না। বরং সবাই ভাববেন, যেই উজবুক দাবী করছে এরকম একটা পেয়ালা ঘুরছে, তাকেই বলুন না কেন বাপু সেটি প্রমাণ করতে! আসলে সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? প্রমাণ করার দায়িত্ব কিন্তু দাবীদারের উপরই বর্তায়। কার্ল স্যাগান বলতেন – 'Extraordinary claims require extraordinary evidence'। কাজেই চীনামাটির চায়ের পেয়ালা ঘুরবার কাহিনীটি আমাদের কাছে যতই মজার লাগুক না কেন, এটি প্রমাণ করার দায়িত্ব তাঁর ঘারেই বর্তাবে, যিনি এমনতর 'Extraordinary' প্রস্তাবটি উত্থাপন করছেন।

বিজ্ঞান কখনোই মঙ্গলের চারিদিকে 'পরিভ্রমণরত চীনা মাটির পেয়লা' কিংবা 'টুথ ফেরি' অথবা 'পঙ্খিরাজ ঘোড়া'র অস্তিত্ব প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। এবং করেনি সঙ্গত কারনেই। আমাদের মধ্যে কেউই হাজার হাজার, কোটি কোটি দেবতা, অপদেবতা, ভুত, ভগবান, শয়তান , রাক্ষস, খোক্কস, হুর-পরী ইত্যাদির অনস্তিত্ব প্রমাণ করার দায়ভার কখনোই অনুভব করেন না; এবং না করেই ওগুলোর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী থাকেন। সেটাই স্বাভাবিক। জওহের সাহেব যখন জিউস, অ্যাপেলো, আমোন রা, দুর্গা, কালী, মিথ্রা, থর কিংবা 'ফ্লাইং স্পেগেটি মন্সটার'কে মিথ বলে মেনে নিয়েছেন, আমি তার সেই মিথের তালিকায় আরেকটি অতিরিক্ত সত্ত্বার সংযোজন করেছি, আর সেটি হচ্ছে জওহের সাহেবের মনগড়া 'ঈশ্বর'।

জওহের সাহেব কোন ধরনের অংক কষে দেখালে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব মেনে নেবেন তা অবশ্য তিনি পরিস্কার করেন নি। কিন্তু তিনি নিজেই আবার তাঁর প্রবন্ধে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আধুনিক কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব খুব ভালভাবে দেখিয়েছে যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে পারে নিতান্তই প্রাকৃতিক নিয়মে- কোন পরম পুরুষের হাতের ছোঁয়া ছাড়াই, স্বতস্ফুর্তভাবে। এর পরও নাস্তিকদের কাঁধে দায়িত্ব থাকে কিভাবে? বরং আমার তো মনে হয় বল এখন রয়ে গেছে আস্তিকদের কোর্টে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হলে তাদেরই বরং আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোকে ভুল প্রমাণ করে বলতে হবে যে, না - এভাবে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে বিশ্বজগৎ কোনমতেই তৈরী হতে পারে না; ঈশ্বরের হাত লাগবেই। শুধুমাত্র আইনস্টাইনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাপারটি এড়িয়ে গেলে চলবে না।

প্রসঙ্গতঃ বলে নেওয়া ভাল যে, সব কিছুর পেছনে সৃষ্টিকর্তা থাকতে হবে, কিংবা সব ঘটনার পেছনেই কারণ থাকতে হবে, এটি স্বতঃ সিদ্ধ বলে ভাবে নেওয়ার আসলেই কোন যৌক্তিক কারণ নেই। আকাশে যখন 'সন্ধ্যার মেঘমালা' খেলা করে, কিংবা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসে সুচারু নক্সার হিমশৈল, অথবা একপশলা বৃষ্টির পর পশ্চিম আকাশে উদয় হয় বর্ণিল রংধনুর, আমরা সত্যই মুগ্ধ হই, বিস্মিত হই। কিন্তু আমরা এও জানি এগুলো তৈরী হয়েছে স্রষ্টা ছাড়াই পদার্থবিজ্ঞানের কিছু সূত্রাবলী অনুসরণ করে। এছাড়া পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে যারা গবেষণা করেন তারা সকলেই জানেন, রেডিও অ্যাকটিভ ডিকের মাধ্যমে আলফা

বিটা, গামা কনিকার উদ্ভব হয় প্রকৃতিতে কোন কারণ ছাড়াই, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এছাড়াও 'ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন'-এর ঘটনাও একটি কারণবিহীন ঘটনা বলে পদার্থবিজ্ঞানের জগতে অনেক আগে থেকেই স্বীকৃত।

অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে শুন্য থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হওয়া কোন অসম্ভব বা অলৌকিক ব্যাপার নয়। এবং এভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হলে তা পদার্থবিজ্ঞানের কোন সূত্রকেই আসলে অস্বীকার করা হয় না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসরণ করে শূন্য অবস্থা থেকে যে বিশ্বজগৎ তৈরী হতে পারে- এ ধারণাটি আসলে সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেছিলেন নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির এডয়ার্ড ট্রায়ন, ১৯৭৩ সালে[†]। ১৯৮১ সালে মহাজাগতিক স্ফীতি তত্ত্বের (cosmic inflation) আবির্ভাবের পর থেকেই বহু তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী প্রাথমিক কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে মহাজাগতিক স্ফীতিকে সমন্বিত করে তাদের মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন। বহু বৈজ্ঞানিক জার্নালে সেগুলো প্রকাশিতও হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে এখানে কিছু সাম্প্রতিক পেপারের উল্লেখ করা যেতে পারে[‡] :

> David Atkatz and Heinz Pagels, "Origin Of The Universe as a Quantum Tunneling Event" Physical review D25 (1982): 2065-73;
>
> S.W. Hawking and I.G.Moss "Supercooled Phase Transitions in the Very Early Universe ", Physics letters B110 (1982):35-38;
>
> Alexander Vilenkin, "Creation of Universe from Nothing" Physics letters 117B (1982) 25-28,
>
> Alexander Vilenkin, "Quantum Origin of the Universe" Nuclear Physics B252 (1985) 141-152,
>
> Andre Linde, "Quantum creation of the inflationary Universe," Letter Al Nuovo Cimento 39(1984): 401-405
>
> Victor Stenger, The Universe: The Ultimate Free Lunch," European Journal of Physics 11 (1990) 236-243. ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃ স্ফুর্তভাবে শূন্য থেকে মহাবিশ্বের উদ্ভবের ধারণাটি যদি স্রেফ 'ননসেন্স'ই হত, তবে বৈজ্ঞানিক জার্ণালগুলোতে এই ধারণার উপর আলোকপাত করা পেপারগুলো সাম্প্রতিক সময়ে কখনই প্রকাশিত হত না। এ বিষয়ে আলোকপাত করে আমি আমার বই 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'(অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫) তে লিখেছি। এ ছাড়া এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়েও একাধিক প্রবন্ধে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে; বিদগ্ধ পাঠকেরা পড়ে দেখতে পারেন।

---

† E.P. Tryon, "Is the Universe a Vacuum Fluctuation?", Nature 246 (1973): 396-97.

‡ For more popular level work, readers are requested to read Guth's Grand Guess (Discover, 2002) or "The self-reproducing Inflationary Universe" (Scientific American, 1998).

কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে একেবারে শুন্য থেকে মহাবিশ্ব উদ্ভবের ধারণা ছাড়াও আরো একটি ধারণা খুব সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে। পল স্টেইনহার্ট এবং নেইল টুরক তাদের প্রস্তাবিত চক্রাকার বা সাইক্লিক মডেলে দেখিয়েছেন এ মহাবিশ্বের কোন শুরু নেই, শেষ নেই। এ এক চলমান 'এন্ডলেস ইউনিভার্স' (এ নিয়ে প্রথম অধ্যায়ের প্রবন্ধ 'ঈশ্বরই কি সৃষ্টির আদি বা প্রথম কারণ?' এবং 'মহাবিশ্ব ও ঈশ্বর : একটি দার্শনিক আলোচনা' দ্রঃ)। ভবিষ্যতের পর্যবেক্ষণলব্ধ গবেষণা থেকে হয়ত জানা যাবে স্বতঃ স্ফুর্তভাবে শূন্য থেকে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে মহাবিশ্বের ধারণাটি সঠিক, নাকি চক্রাকার অফুরন্ত মহাবিশ্বের ধারনাটি ঠিক। কিন্তু যেটিই ঠিক হোক না কেন ঈশ্বর নামক অনুকল্পটি যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় তা হয়ত প্রমাণিত হয়ে যাবে। কারণ আস্তিকতা-নাস্তিকতা বিবাদের সারাংশটি হবে এরকম –

> **আস্তিকঃ** এই মহাবিশ্ব তৈরি করেছে কে? নিশ্চয় ঈশ্বর।
> **নাস্তিকঃ** তা হলে সেই ঈশ্বরকে তৈরি করেছে কে?
> **আস্তিকঃ** কেউ না। ঈশ্বর সয়ম্ভু; কিংবা হয়ত সব সময়ই ছিলেন।
> **নাস্তিকঃ** তা হলে আমরাও বলতে পারি এই মহাবিশ্ব সয়ম্ভু (কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে উদ্ভুত) কিংবা মহাবিশ্বও হয়ত সবসময় ছিলো (চির অনন্ত সাইক্লিক ইউনিভার্স)।

দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে অদূর ভবিষ্যতে ঈশ্বর নামক অনুকল্পকে গ্রহণ না করেই মহাবিশ্বের উদ্ভব কিংবা অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি কিন্তু সে দিকেই ইঙ্গিত করছে।

আরো কিছু অঙ্ক কষা যাক। অঙ্ক কষে 'ঈশ্বর নেই' এটা প্রমাণ করতে চাওয়ার আগে জেনে নেওয়া ভাল যে, ঈশ্বরের কোন যুক্তিগ্রাহ্য সংজ্ঞা বাজারে আছে কিনা। কবি সাহিত্যিক থেকে শুরু করে ভাবুক দার্শনিকটি পর্যন্ত যে যার মত ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করেন। কেউ প্রেমিকার চোখে, কেউ বা রাত্রির জ্যোৎস্নায়, কেউ কবিতায়, কেউবা গানে, কেউ সুরা-সাকীতে, কেউ জনসেবায়, কেউ প্রকৃতিতে কিংবা কেউবা আবার সচিন তেন্ডুলেকরের ব্যটিং-এ ঈশ্বরকে খুঁজে পান। এধরনের অব্যক্ত মানবিক আবেগ, উপমা, মনের ভাবগত প্রতিরেৈপকে সঠিক বা ভুল প্রমাণ করার কিছু নেই, বিজ্ঞান ওসব নিয়ে কাজও করে না। বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিঁখুত বাস্তবতায়। যে সমস্ত বিষয় সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত নয়, সে গুলো নিয়ে বিজ্ঞানের কোন মাথাব্যথা নেই। ঈশ্বরের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে তাকালেও দেখা যায় সেখানে স্ববিরোধিতার ছড়াছড়ি। যেমন বাইবেলের ধারনা অনুযায়ী ঈশ্বর অদৃশ্য (Col. 1:15, ITi 1:17, 6:16), এমন একটি সত্ত্বা যকে কখনও দেখা যয় নি (John 1:18, IJo 4:12)। অথচ বাইবেলেরই বেশ কিছু চরিত্র যেমন মুসা (Ex 33:11, 23), আব্রাহাম, জেকব (Ge. 12:7,26:2, Ex 6:3) ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। ঈশ্বর পরিস্কার করেই বাইবেলে বলেছেন – 'you cannot see my face, for no one can see me and live' (Ge 32:30)। অথচ, জেকব ঈশ্বরকে জীবন্ত দেখেছেন (Ge 32:30)। এগুলো

তো পরিস্কার স্ব-বিরোধীতা। ঠিক একই কথা বলা যায় হজরত মুহম্মদের 'মিরাজে'র ক্ষেত্রেও। আরজ আলী মাতুব্বর তার 'সত্যের সন্ধান' গ্রন্থে লিখেছেন,

> 'এ কথায় প্রায় সকল ধর্মই একমত যে, 'সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র বিরাজিত'। তাহাই যদি হয়, তবে তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্য দূরে যাইতে হইবে কেন? আল্লাহতা'লা কি ঐ সময় হযরত (দ.) - এর অন্তরে বা তাঁহার গৃহে, মক্কা শহরে অথবা পৃথিবীতেই ছিলেন না? পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলিয়াছেন - 'তোমরা যেখানে থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন' (সুরা হাদিদ - ৪)। মেরাজ সত্য হইলে এই আয়াতের সহিত তাহার কোন সঙ্গতি থাকে কি?'

আরও দেখা যায়, একটি ধর্মের ঈশ্বরের সাথে আরেকটি ধর্মের ঈশ্বরের বিস্তর ফারাক। এক ধর্মের ঈশ্বর কোরবানি করলে খুশি হন তো আরেক ধর্মের ঈশ্বর জীব হত্যাকে মহাপাপ মনে করেন। এক ধর্মের ঈশ্বরের কাছে মুর্তি পুজা বৈধ, আরেক ধর্মের ঈশ্বরের কাছে তা শিরকতুল্য অপরাধ। এক ধর্মের ঈশ্বরের কাছে শুয়োরের মাংস হারাম, আরেক ধর্মের ঈশ্বরের কাছে নয়। এক ধর্মের ঈশ্বরের কাছে গোহত্যা মহাপাপ হলেও, আরেক ধর্মের ঈশ্বরের কাছে তা উৎসব। এক ধর্মের ঈশ্বরের অনুসারীরা দাঁড়ি রাখায় পুন্য খুঁজলে আরেক ধর্মের অনুসারীরা খোঁজেন টিকি রাখায়! ধর্মগ্রন্থগুলোর বাণীগুলোকে অভ্রান্ত ধরে ঈশ্বরের সার্বজনীন সংজ্ঞা খুঁজতে গেলে তো মাথার সমস্ত চুল পড়ে যাবার দশা হবে! তারপরও ধর্ম-দর্শন নির্বিশেষে যে বেশিষ্ট্যগুলো দিয়ে ঈশ্বরকে সচরাচর মহিমান্বিত করা হয় সেগুলো সবই দেখা গেছে যুক্তির কষ্ঠিপাথরে খুবই ভঙ্গুর। যেমন, ঈশ্বরকে বলা হয় 'পরম দয়াময়' (all-loving) এবং সর্ব শক্তিমান (all-powerful or omnipotent), নিখুঁত (perfect), সর্বজ্ঞ (omniscient) ইত্যাদি। কিন্তু সর্বশক্তিমত্তা (omnipotence) এবং সর্বজ্ঞতা (omniscience) যে একসাথে প্রযোজ্য হতে পারে না তা যুক্তিবাদীদের দৃষ্টি এড়ায়নি। ক্যারেন ওয়েন্স তা সুন্দরভাবে নিম্নোক্ত পংক্তিতে তুলে ধরেন[§] –

> *Can Omniscient God, who*
> *Knows the future, find*
> *The omnipotence to*
> *Change His future mind?*

কথা হচ্ছে, ঈশ্বর যদি সর্বজ্ঞ বা 'অমনিসায়েন্ট' হন, তবে তিনি আগে থেকেই জানেন যে তিনি ভবিষ্যতের ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে সেটি পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন। ভবিষ্যৎ ঘটনা তিনি শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন করতেই পারেন – কারণ তিনি সর্বশক্তিমান, আফটার অল! কিন্তু মুশকিল হল, তিনি কি করবেন তা অনেক আগে থেকেই জানার মানে হল শেষ সময়ে আকস্মিকভাবে মত পরিবর্তন করা তার পক্ষে অসম্ভব। আর তার পক্ষে কোন কিছু অসম্ভব মানেই হচ্ছে তিনি সর্বশক্তিমান নন।

ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান নন, তা নিচের প্রশ্নটির সাহায্যে সহজেই দেখানো যেতে পারে –

[§] Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books; 1 edition (January 16, 2008) থেকে উদ্ধৃত।

যদি প্রশ্ন করা হয় -

'ঈশ্বর কি এমন কোন ভারী পাথরখন্ড তৈরি করতে পারবেন, যা তিনি নিজেই উঠাতে পারবেন না?'

এ প্রশ্নটির উত্তর যদি হ্যা হয় – তার মানে হচ্ছে ঈশ্বরের নিজের তৈরি পাথর নিজেই তুলতে পারবেন না, এর মানে তিনি সর্বশক্তিমান নন। আবার প্রশ্নটির উত্তর যদি না হয়, তার মানে হল, সেরকম কোন পাথর তিনি বানাতে পারবেন না, এটাও প্রকারান্তরে তার অক্ষমতাই প্রকাশ করছে। এ থেকে বোঝা যায়, অসীম ক্ষমতাবান বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলতে কিছু নেই। দেখা গেছে, মানুষের কাছে যা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব, তা ঈশ্বরও তৈরি করতে পারছেন না। ঈশ্বর পারবেন না চারকোনা বৃত্ত আঁকতে, ঈশ্বর পারবেন না কোন 'বিবাহিত ব্যাচেলর' দেখাতে কারণ এগুলো যৌক্তিকভাবে অসম্ভব।

ঈশ্বর যে পরম করুণাময় বা 'অল লাভিং' নন, তা বুঝতে রকেট সায়ন্টিস্ট হতে হয় না। আরজ আলী মাতুব্বর তার 'সত্যের সন্ধানে' গ্রন্থে বলেছেন,

> 'কোন ব্যক্তি যদি একজন ক্ষুধার্তকে অন্নদান ও একজন পথিকের মাল লুণ্ঠণ করে, একজন জলমগ্নকে উদ্ধার করে ও অন্য কাউকে হত্যা করে অথবা একজন গৃহহীনকে গৃহদান করে এবং অপরের গৃহ করে অগ্নিদাহ, তবে তাহাকে 'দয়াময়' বলা যায় কি? হয়ত তাহার উত্তর হইবে - 'না'। কিন্তু উপরোক্ত কার্যকলাপ সত্ত্বেও ঈশ্বর আখ্যায়িত আছেন 'দয়াময়' নামে। ... জীব জগতে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বিদ্যমান। যখন কোন সবল প্রাণী দুর্বল প্রাণীকে ধরিয়া ভক্ষণ করে, তখন ঈশ্বর খাদকের কাছে দয়াময় বটে, কিন্তু তখন কি তিনি খাদ্য-প্রাণীটির কাছেও দয়াময়? যখন একটি স্বর্প একটি ব্যাঙকে ধরিয়া আস্তে আস্তে গিলিতে থাকে, তখন তিনি স্বর্পটির কাছে দয়াময় বটে। কিন্তু ব্যাঙটির কাছে তিনি নির্দয় নহেন কি? পক্ষান্তরে তিনি যদি ব্যাঙটির প্রতি সদয় হন, তবে সর্পটি অনাহারে মারা যায় না কি? ... কাহারো জীবন রক্ষা করা যদি দয়ার কাজ হয় এবং হত্যা করা হয় নির্দয়তার কাজ, তাহা হইলে খাদ্য-খাদকের ব্যাপারে ঈশ্বর সদয়ের চেয়ে নির্দয়ই বেশী। তবে কতগুন বেশী তাহা তিনি ভিন্ন অন্য কেউ জানে না, কেননা তিনি এক একটি জীবের জীবন রক্ষা করার উদ্দেশে অসংখ্য জীবকে হত্যা করিয়া থাকেন। কে জানে একটি মানুষের জীবন রক্ষর জন তিন কয়টি মাছ, মোরগ, ছাগল ইত্যাদি হত্যা করেন?... কেহ কেহ মনে করেন ঈশ্বর সদয়ও নহেন এবং নির্দয়ও নহেন। তিনি নিরাকার নির্বিকার ও অনির্বচনীয় এক সত্তা। যদি তাহা নাই হয়, তবে পৃথিবীতে শিশুমৃত্যু, অপমৃত্যু, এবং ঝড়, বন্যা, মহামারী, ভুমিকম্প ইত্যাদি প্রাণহানিকর ঘটনাগুলির জন্য তিনিই কি দায়ী নহেন?'

আরজ আলীর প্রশ্নমালা মানব মনের অন্তহীন সংশয়বাদী চিন্তাকেই তুলে ধরেছে সার্থকভাবে। গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস (৩৪১-২৭০ বিসি) সর্বপ্রথম 'আর্গুমেন্ট অব এভিল' (Argument of Evil)-এর সাহায্যে 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের' অসারতা তুলে ধরেন এভাবে :

ঈশ্বর কি অন্যায়-অবিচার-অরাজগতা নিরোধে ইচ্ছুক, কিন্তু অক্ষম?
তাহলে তিনি সর্বশক্তিমান নন।

তিনি কি সক্ষম, কিন্তু অনিচ্ছুক?
তাহলে তিনি পরম দয়াময় নন, বরং অপকারী সত্ত্বা।

তিনি কি সক্ষম এবং ইচ্ছুক -দুটোই?
তাহলে অন্যায়-অবিচার-অরাজগতা পৃথিবীতে বিরাজ করে কিভাবে?

তিনি কি সক্ষমও নন, ইচ্ছুকও নন?
তাহলে কেন তাঁকে অযথা 'ঈশ্বর' নামে ডাকা?

অকাট্য এই যুক্তি। বস্তুত 'The Oxford Companion to Philosophy' স্বীকার করেছে যে, সনাতন আস্তিকতার বিরুদ্ধে আর্গুমেন্ট অব এভিল বা 'মন্দের যুক্তি' সবচেয়ে শক্তিশালী মরণাস্ত্র, যা কেউই এখন পর্যন্ত ঠিকমত খন্ডন করতে পারেনি[**]। এ তো নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, প্লেগ, মহামারী, খড়া, বন্যা, সুনামীর মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে লক্ষ কোটি নিরপরাধ নর-নারী এবং শিশুর মৃত্যুর ব্যাপারে মানুষকে কোনভাবেই দায়ী করা চলে না। এ সমস্ত অরাজগতার অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে ঈশ্বর একটি অপকারী সত্ত্বা। কারণ 'সর্বজ্ঞ' ঈশ্বর আগে থেকেই জানতেন যে, সুনামীর ঢেউ আছড়ে পরে তার নিজের সন্তানদের হত্যা করবে, তাদের স্বজন হারা করবে, গৃহচ্যুত করবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, ঘর বাড়ি ধ্বংস করে এক অশুভ তান্ডব সৃষ্টি করবে। অথচ আগে থেকে জানা থাকা সত্ত্বেও সেসব প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থাই তিনি নিতে পারেন নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় ঈশ্বর এক অক্ষম, নপুংশক সত্ত্বা বই কিছু নয়। এ বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে পল কার্জ তার 'ধর্মীয় দাবী সম্বন্ধে যে কারণে আমি সংশয়বাদী' প্রবন্ধের একটি অংশে 'আর্গুমেন্ট অব এভিল' নিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া, এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে 'স্বাধীন ইচ্ছা, মন্দ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব' নামের প্রবন্ধটিতে লেখক অপার্থিব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা আসলে পরষ্পরবিরোধী।

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা কিংবা সর্বশক্তিমত্তা যে পরষ্পরবিরোধী তা অনেক আগেই দেখিয়েছেন আরজ আলী মাতুব্বরও। তিনি তাঁর 'সত্যের সন্ধান' গ্রন্থে বিধাতার 'সর্বশক্তিমত্তা'র দাবী খন্ডন করে লেখেন :

> 'বলা হয় যে, আল্লাহর অনিচ্ছায় কোন ঘটনা ঘটে না। এমনকি গাছের পাতাও নড়ে না। বিশেষত তাঁহার অনিচ্ছায় যদি কোন ঘটনা ঘটিতে পারে তাহা হইলে তাঁহার 'সর্বশক্তিমান' নামের সার্থকতা কোথায়? আর যদি আল্লাহর ইচ্ছাতেই সকল ঘটনা ঘটে, তবে জীবের দোষ বা পাপ কি?'

একই কথা একটু অন্যভাবে বলেছেন প্রবীর ঘোষ তার 'আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' বইয়ে –

> 'আল্লাহ ঈশ্বর সব কিছুর নিয়ন্তা। সর্বশক্তিমান। তাঁর ইচ্ছে ছাড়া গাছের পাতাটি নড়ে না, মানুষের নিঃশ্বাস পড়ে না। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরই ভজনার জন্য। তাঁরই গুন-কীর্তনের জন্য। তাহলে সমস্ত মানুষকে দিয়ে তাঁর গুন-কীর্তন করাতে পারছেন না কেন? যুক্তিনিষ্ঠ মানুষগুলো ঈশ্বর, আল্লাহর গুণ-কীর্তন করা তো দূরের কথা, বরং অস্তিত্ব নিয়েই টানা হ্যাচড়া শুরু করেছে। ঈশ্বর এই সব যুক্তিবাদী মানুষদের কেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না? কেন ওইসব বে-আক্কেলদের মুখ থেকে ঈশ্বর-আল্লাহর ভজনা

[**] Ted Honderich, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, USA (1995)

> বের করতে পারছেন না? তব কি যুক্তিবাদীদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ঈশ্বরের নেই? যুক্তিবাদীদের কাছে ঈশ্বরজাতীয়দের সব জারিজুরিই কি তবে ফক্কা?'

তারপরও ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান আর দয়াময় জ্ঞানে পুজো করা চলছেই। চলছে প্রার্থনাগীত, স্তব স্তোত্র, ঈশ্বর-বন্দনা, ঈশ্বর-মাহাত্ম্য। এ চলবেই। তা চলুক আপত্তি নেই। কিন্তু একটি আগাগোরা পরষ্পরবিরোধী এবং অসংজ্ঞায়িত বিষয়কে গনিতের সাহায্যে ভুল প্রমাণের আহ্বান জানানোর আগে জওহের সাহেব আরেকটু ভাবলে বোধ হয় ভাল করতেন।

জনাব মেজবাহউদ্দিন জওহের জীবন-মৃত্যু, আত্মা, লাইফফোর্স ইত্যাদি বিষয়ের ভুল ভাবে অবতারনা করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাফাই গেয়েছেন। বস্তুতঃ আত্মা এবং লাইফ ফোর্স- দুটোই খুবই অবৈজ্ঞানিক শব্দ এবং বিজ্ঞান এগুলোর অস্তিত্বকে স্বীকার করার মত তথ্য প্রমাণ পায়নি। এগুলো আসলে মানুষের আদিম কল্পণা, অজস্র মিথের মতই কিছু মিথ। প্রবন্ধের আকারের কথা স্মরণ রেখে আমি এই মুহূর্তে এ বিষয়গুলো নিয়ে এখানে বিস্তারিত কিছু বলতে চাইছি না। জীবন-মৃত্যুর আধুনিক ধারণা সঙ্কলিত করে এবং আত্মার অস্তিত্ব ছাড়াই কিভাবে প্রাণকে ব্যাখ্যা করা যায় এ নিয়ে আমি এবং ফরিদ আহমেদ মিলে গতবছর একটি বই লিখেছিলাম – 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' (অবসর, ২০০৭)। সে বইয়ে আমরা দেখিয়েছিলাম, 'আত্মা' এবং 'লাইফ ফোর্স' বা 'জীবন শক্তি' তত্ত্বের মূল হোতা আসলে প্লেটোর ভাববাদী দর্শন। এ দর্শন শিখিয়েছিলো যে, প্রাণী বা উদ্ভিদ কেউ জীবিত নয়, কেবলমাত্র ঈশ্বর যখন প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহে আত্মা প্রবেশ করান, তখনই তাতে জীবনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। প্লেটোর এই 'জীবনশক্তি তত্ত্ব' অ্যারিস্টটলের দর্শনের রূপ নিয়ে প্রায় দু'হাজার বছর মানব সভ্যতাকে শাসন করেছিল। পরবর্তীতে পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মমত এই দর্শনকে ধর্মের 'মূল উপজীব্য' হিসেবে আত্মস্থ করে নেয়। তাই অধিকাংশ মানুষ আজও আত্মা দিয়ে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার প্রাচীন প্রয়াস থেকে মুক্তি পায়নি। এ ছাড়া, আমাদের এই বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে 'আত্মা বলে সত্যই কি কিছু আছে?' প্রবন্ধটিতে আমি আরো বিস্তারিতভাবে আত্মার অসারতা দেখিয়ে বলেছি - বস্তুতঃ স্নায়ুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, জেনেটিক্স আর বিবর্তনবিজ্ঞানের নতুন নতুন গবেষণা আত্মাকে আক্ষরিক ভাবেই রঙ্গমঞ্চ থেকে হটিয়ে দিয়েছে। একই অধ্যায়ে সংকলিত ফরিদ আহমেদ অনুদিত মাইকেল শারমারের 'পরকালের পরাবাস্তবতা' প্রবন্ধটিও আত্মা সংক্রান্ত মিথগুলো খন্ডন করেছে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। আর সেজন্যই যুগল-সর্পিলের (ডিএনএ) রহস্যভেদকারী নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক বলেন, 'একজন আধুনিক স্নায়ু-জীববিজ্ঞানী মানুষের এবং অন্যান্য প্রানীর আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য আত্মা নামক ধর্মীয় ধারণার দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না'। ১৯২১ সালে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন একই ধারণা পোষণ করে বলেছিলেন, 'দেহবিহীন আত্মার ধারনা আমার কাছে একেবারেই অর্থহীন এবং অন্তঃসারশূন্য'। আগ্রহী পাঠকেরা এ বইয়ের ষষ্ঠ এবং সপ্তম অধ্যায়ের প্রবন্ধগুলো আরেকবার পড়ে দেখতে পারেন।

জওহের সাহেবের একটি উক্তি নিয়ে আমি এখানে কিছু কথা বলতে চাই। তিনি প্রাণের উদ্ভবের পেছনে ঈশ্বরের হাত থাকার প্রতি ইংগিত করে বলেছেন, 'কিন্তু বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগেও ল্যাবরেটরীতে এ্যামিনো এসিড ও প্রোটিন একত্রে মিশিয়ে একটি জীব কোষ তৈরী করা যায় নি। মানুষের জ্ঞান এমন

পর্যায়ে পোঁছেচে যে সে ক্লোন করে হুবহু আরেকটি মানুষ তৈরী করে দিতে পারে। অথচ অতি ক্ষুদ্র একটি জীবকোষ তৈরী করতে পারে না'। এই উক্তির মাধ্যমে জনাব জওহের সাহেব যেটি তুলে ধরেছেন তা হল বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা কোন ঈশ্বরের প্রমাণ নয়। তার আর্গুমেন্টটি এরকম :

** বিজ্ঞান এই মুহূর্তে ল্যাবরেটরীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটাতে পরছে না*
** অতএব প্রাণের উদ্ভবের পেছনে ঈশ্বরের একটা ভুমিকা আছে।*

এটি খুবই ভুল যুক্তি। বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সব যুগেই ছিল, থাকবে। আবার অনেক সীমাবদ্ধতাই বিজ্ঞান অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়েছে। বিজ্ঞান স্থির নয়, সতত গতিশীল। এটা ঠিক প্রাণের উদ্ভবের পেছনে বিরাজমান সৃষ্টির আদি নিয়ামকগুলোর অনেক কিছুই এখনও অজানা, অনেক কিছুই এই মুহূর্তে ব্যাখ্যাতীত, কিন্তু তা বলে এ নয় যে তার পেছনে ঈশ্বর নামক কোন কাল্পনিক সত্ত্বাকে আমাদের মেনে নিতে হবে। আজকের বিজ্ঞানীদের কাছে যা অজানা ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা তার সমাধান নিয়ে আসবেন, এবং তা তারা সমাধান করবেন বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই। এভাবেই প্রতিনিয়ত আমাদের জ্ঞান এগুচ্ছে। অনেকেই এ ব্যাপারটি বুজতে চান না। যখনই কোন রহস্য সমাধান করতে তারা ব্যর্থ হন, এর পেছনে ঈশ্বরের ভুমিকাকে কল্পনা করে নেন। যখনই আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ফাঁক ফোকর দেখতে পান, এর ভিতরে ঈশ্বরকে গুজে দিয়ে এর একটা সহজ সমাধান দিতে সচেষ্ট হন। এধরনের আর্গুমেন্টকে দর্শনের পরিভাষায় বলে 'গড ইন গ্যাপস'। একটা সময় যখন বিজ্ঞান এতটা উন্নতির শিখরে ছিল না- আস্তিকেরা তাই যেখানে সেখানে ঈশ্বরকে আবিস্কার করতেন, যেখানেই রহস্য দেখতেন, বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা খুঁজে পেতেন, সেখানেই তারা ঈশ্বরকে পেয়ে যেতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে যতই ফাঁক ফোঁকর ভরাট হয়ে যাচ্ছে, ততই তাদের ঈশ্বর লজ্জিত হয়ে নিজের পরিসীমা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রত্তর করে ফেলছে। একটা সময় মানুষ আকাশে খোদার আরশ আর স্বর্গের জন্য আলাদা স্থান চিহ্নিত করেছিল। কথিত আছে রাবন নাকি এই পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত সিঁড়ি বানানোরও পায়তারা করেছিলেন। তার মানে মানুষেরা মহাকাশে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি জায়গাতেই স্বর্গ, নরক, খোদার আসনের কল্পণা করেছিল। কিন্তু টেলিস্কোপ যন্ত্রের আবিস্কারের পর আর গ্যালিলিও নিউটনের অবদানের পরে আর আকাশে খোদার আরশ আর খুঁজে পাওয়া যায় না, খোদা এখন লুকিয়ে পড়েছে 'বিজ্ঞানীরা কি ল্যাবরেটরীতে জীবকোষ তৈরী করতে পেরেছে' অথবা 'মানুষ কি মৃত্যুকে জয় করতে পেরেছে?' অথবা 'বিগ ব্যাং-এর আগে কি ছিল বিজ্ঞান কি তা ব্যাখ্যা করতে পারে?' - এধরনের কিছু আপ্তবাক্যের ভিতরে। বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরীর ফ্লাস্কে জীব কোষ তৈরী করতে না পারলেও ফ্লাস্কে কৃত্রিমভাবে আদিম পরিবেশের প্রতিরূপ সৃষ্টি করে অনেক আগেই দেখিয়েছেন যে, এ পৃথিবীতেই আদিম অবস্থায় অজৈব পদার্থ হতে জীবনের উৎপত্তি হয়েছে এবং তা কোন রহস্যজনক কারনে নয়, বরং জানা কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। নোবেল বিজয়ী রসায়নবিদ হ্যারলড সি ইউরে আর তার ছাত্র স্টেনলি এল মিলারের পরীক্ষাটি এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। এভাবে তারা উচ্চ তাপে আর চাপে অজৈব পদার্থ থেকে এ্যামিনো এসিডের সন্ধান লাভ করেন যাকে জীবনের ভিত্তিমূল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এরপরেও বিজ্ঞানীরা এখনো এমন কোন জীবকোষ ল্যাবরেটরীতে তৈরী করতে পারেন নি যা ফ্লাস্কের গা বেয়ে নেমে এসে আমাদের চমকে দেবে। এর একটি প্রধান কারণ - 'সময়'। জীবকোষ তৈরীর পেছনে পৃথিবীতে বিবর্তন প্রক্রিয়া চলেছে কোটি কোটি বছর ধরে। আর এই কোটি বছরে পৃথিবীর আবহাওয়াও বদলেছে বিস্তর। যেমন,

আদিম পরিবেশে মুক্ত-অক্সিজেন ছিল না, আক্সিজেনহীন বিজারকীয় আবহাওয়া আক্সিজেনময় জারকীয় আবহমন্ডলে রূপান্তরিত হয় আজ থেকে দুই বিলিয়ন বছর আগে। আবার বর্তমান বিশ্বের বায়ুমন্ডলে আদিম পরিবেশের মত মিথেন ও এ্যামোনিয়া নেই, তার জায়গায় আছে জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, আনবিক নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও প্রচুর আনবিক অক্সিজেন। এই কোটি বছরের সময়-প্রসার আবহমন্ডলের পরিবর্তনকে ল্যাবরেটরীর ফ্লাস্কে বেঁধে রাখা যায় না। ক্লোন করতে কোটি কোটি বছর অপেক্ষার ঝক্কি নেই বলে ক্লোন করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু প্রোটিনয়েড, কো-এসারভেট, নিউক্লিয়িক এসিড, নিউক্লিয়প্রোটিন গঠনের সময়সাপেক্ষ ধাপ পেরিয়ে আদিম জীবকোষ বা ইউবায়োন্ট একারণেই এখনো তৈরী করা সম্ভব হয়নি। কৃত্রিম প্রাণ তৈরি করা না গেলেও বিজ্ঞানীরা প্রাণ তৈরির খুব কাছাকাছি অবস্থায় রয়েছেন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। রসায়নাগারে কৃত্রিমভাবে ভাইরাস তৈরী করার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে অনেক দিন হল; পোলিও ভাইরাস সহ দশ হাজার প্রজাতির ভাইরাস তৈরী করা গেছে ভাইরাসের জিনোম পর্যবেক্ষন করে এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে। এক ব্যাক্টেরিয়া থেকে অন্য ব্যাক্টেরিয়াতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াও সফল হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই তৈরির পথে পাওয়া গেছে এমন কিছু তথ্য যা আমাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রে রীতিমত বিপ্লব এনেছে। ক্রেগ ভেন্টর সহ অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন আর আগামী দুই বছরের মধ্যেই আদি কোষ বা প্রোক্যারিওট আর দশ বছরের মধ্যে প্রকৃত কোষ বা ইউক্যারিওট বানানো সম্ভব হবে। একটা সময় আসবে যখন বিজ্ঞান এ ধরণের অন্তিম রহস্যের অনেকগুলোই সমাধান করে ফেলবে, তখন এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক ফোকর গুলো আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে, তারপরও হয়তো কিছু বিশ্বাসী মানুষ থাকবেন যারা ফাঁক ফোকর খুজে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবেন :' হু, প্রাণ তো তৈরি করলে বাপু, সে প্রাণের বুদ্ধিসুদ্ধি তো আমার মত দেখছি না। আমার বুদ্ধি কেন তোমার বানানো প্রানীটার চেয়ে এত বেশি হল -নিশ্চয়ই বিজ্ঞান কখনো এগুলোর জবাব দিতে পারবে না। কাজেই ক্ষমা চাও ঈশ্বরের কাছে, নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করো হে অবোধ শিশু ... ”

আমি আমার লেখাটি শেষ করব নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের বিষয়টি আরেকটু পরিস্কার করে। অনেকেই সজ্ঞাতভাবে ধরে নেন যে, ধর্ম না থাকলে সমাজ উচ্ছন্নে যাবে। নাস্তিক হয়ে গেলে মানুষ খুন খারাপি রাহাজানি যা ইচ্ছে করতে পারে। কিন্তু এগুলো সবই সজ্ঞাত ধারণা, প্রমাণিত সত্য নয়। আমি এ বইয়ের পঞ্চম অধ্যেয়ে আমার 'নৈতিকতা কি শুধুই বেহেস্তে যাওয়ার পাসপোর্ট?' প্রবন্ধে অনেক পরিসংখ্যান হাজির করে দেখিয়েছি, ধার্মিক হলেই মানুষ সৎ হয় না, কিংবা নাস্তিক হলেই মানুষ পশু হয়ে যায় না। নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ব্যাপারগুলো মুলতঃ নির্ভর করে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সমাজ সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর। আমার প্রবন্ধটি ছাড়াও অপার্থিব, ভিক্টর স্টেংগর এবং স্যাম হারিস তাদের নিজ নিজ প্রবন্ধে পরিস্কার করেছেন যে, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ব্যাপারগুলো মোটেই ঈশ্বরপ্রদত্ত নয়, কিংবা ধর্ম থেকে উদ্ভুত নয়, বরং সমাজ বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবেই এটি মানব সমাজের ভিত্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে। কাজেই আমাদের সমাজে নীতি-নৈতিকতার অস্তিত্ব ঈশ্বর থাকার বা না থাকার কোন প্রমাণ নয়। জওহের সাহেব আরো মনে করেন, পরকালের অস্তিত্ব না থাকলে জীবন অর্থহীন। কারণ এ সমাজে অনেকেই চুরি দারী রাহাজানি করে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজেই তার মতে একমাত্র ইনসাফ হতে পারে মরার পর ঈশ্বর যদি তার বিচার করে! কিন্তু এ তো দুর্বলের আর্তনাদ। মানুষের নির্মিত মানব-সমাজের উদ্ভুত সমস্যাবলীর কারনে সৃষ্ট ভুক্তভোগীদের সকল ঝুট ঝামেলার সমাধান করার জন্য বসে রয়েছেন পরম পিতা জাতীয় কেউ – আমার

আপনার সকল সমস্যা সমাধান করে দেবেনই তিনি, এজীবনে না হলেও পরজীবনে। ঈশ্বর যে মানুষের দুর্বলতাকে পুঁজি করে বেঁচে আছে তা এ থেকেই অনেকটা বোঝা যায়। এ ধরনের চিন্তা অনেকটা মদ খেয়ে জাগতিক দুঃখ ভুলে থাকার প্রচেষ্টা আর কি! বিখ্যাত লেখাক এবং নাট্যকার জর্জ বার্নাড শ তাই বলতেন, এ যেন বাস্তব সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার তাগিদে মদ-খাওয়া মাতালের সাময়িক পরিতৃপ্তি -

> 'The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one.'।

সমাজে লালু ফালুরা দুর্নীতি করে বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে মানুষকেই রুখে দাঁড়াতে হবে। মানুষের মনেই জাগাতে হবে সচেতনতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা। তা না করে ইহকালের বিচারের দাবী পরজগতে ঠেলে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজের সাথে আর সমাজের সাথে বঞ্চনা। বঞ্চনা আর ঈশ্বর এখানে যেন একই সুতোয় গাঁথা। দরিদ্রের দারিদ্র্যের বাস্তবতাকে ভুলিয়ে রাখতে, শ্রমিকের ভাতের দাবীকে ধামাচাপা দিয়ে রাখতে, দুর্নীতির নহর অব্যাহত রাখতে ঈশ্বর নামক ধারণাটির আসলে জুড়ি নেই। তুমি বঞ্চিত, লাঞ্ছিত – গরাদ ভাঙ্গার গান কখনো গেও না, তার চেয়ে যাও ঈশ্বরের কাছে দু হাত তুলে প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই মরার পর তিনি বিচার করবেন। তুমি খেতে পাচ্ছ না? ঈশ্বরের কাছে নতজানু হও। নিশ্চয় তিনি তোমাকে বেহেস্তে নসিব করবেন; আর সেখানে তুমি পাবে অফুরন্ত খাবার। ঈশ্বরের ধুয়া তুলে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখা হয়, তাদের জানতে দেওয়া হয়না সমাজে অসাম্যের মূল উৎসটা আসলে কোথায়। শাসকেরা চায়না সাধারণ মানুষেরা কুসংস্কারের পর্দা সরিয়ে বুঝতে শিখুক – তাদের অসাম্যের কারণ কোন ভাগ্য নয়, পুর্বজন্মের কর্মফল নয়, নয় কোন অপদেবতার কারসাজি। শাসকেরা বরং চায় অসাম্য দূর করার জন্য সাধারণ মানুষেরা রাস্তায় না নেমে মন্দিরে মসজিদে যাক, প্রার্থনা আর দোয়ার নহর বইয়ে দিক, নতজানু হোক ঈশ্বর নামক অলীক চিন্তার কাছে; ভেবে নিক কোন এক ভাগ্য দোষে তার এই দুরবস্থা, এগুলো সব ঈশ্বরের পরীক্ষা – আর ঈশ্বরই তা সমাধান করে দেবেন পরকালে। এভাবে ভাবলে, ভাবাতে পারলে ত শাসক শ্রেনীরই অন্তহীন লাভ। আমরা নাস্তিকেরা, ইহজাগতিক মানুষেরা ইহকালের সমস্যাগুলোকে ইহকালেই সমাধান করার পক্ষপাতি, কোন অলীক সত্ত্বার কাছে প্রতাশা জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। আর এটাই এখন সময়ের দাবী। আমার উত্তরটি শেষ করছি কবি নির্মলেন্দু গুনের 'নাস্তিক' কবিতাটির উদ্ধৃতি দিয়ে –

> নেই স্বর্গলোভ কিংবা কল্প-নরকের ভয়,
> অলীক সাফল্যমুক্ত কর্মময় পৃথিবী আমার৷
>
> চর্মচোখে যা যা দেখি, শারীরিক ইন্দ্রিয় যা ধরে,
> তাকেই গ্রহন করি৷ জানি, নিরাকার অপ্রত্যক্ষ
> শুধুই ছলনা, বিশ্বাস করি না ভাগ্যে, দেবতার বরে৷
>
> আমার জগৎ মুগ্ধ বাস্তবের বস্তুপুঞ্জে ঠাসা,
> তাই সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয় নয়৷

সেই শ্রেষ্ঠ মানব-সন্তান, যার মন মুক্ত ভগবান।
আমার মস্তক নিত্য নত সেই নাস্তিকের তরে।

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ ও ‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - ‘স্বতন্ত্র ভাবনা’। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com